

ଆନନ୍ଦମୟୀ

ଜନ୍ମମୋତ୍ସବ-ସଂଖ୍ୟା

ବୈଶାଖ ୧୩୫୫



- ★ ମାଯେର ରଚିତ କବିତା
- ★ ରାମାଦେବୀର କଥା
- ★ ଚିଠି ଓ ମାଯେର ଉତ୍ତର
- ★ ମା

କବିତା ରାମାଦେବୀ-ମରୀ
ମାଯେର ରଚିତ କବିତା
ଚିଠି ରାମାଦେବୀ, ୧-୧
କବିତା ରାମାଦେବୀ

[ଛୟ ଆନା

সম্পাদক ও প্রকাশক

আনন্দময়ী

আনন্দময়ী আশ্রম

ভদ্রলোক, বারাণসী।

সর্বস্বত্ত্ব সম্পাদকের

প্রিণ্টার—ঈশাহক মল্লিক
নিউ ডায়মণ্ড প্রেস লিঃ
৮-বি, লালবাজার ফ্রিট,
কলিকাতা।

আনন্দময়ী

মাসের রচিত
কবিতা

(১) করুণার বাতি
জলিছে দিবারাতি ॥

(২) সত্য ব্রহ্ম সন্তান
রয়েছেন সর্বক্ষণ ।
পরমানন্দে
দেখ ছন্দে ছন্দে ॥

(৩) বিশ্বমাতার চরণতলে
পড়ারে তার ভাবে ঢ'লে।
স'রে যাবে বন্ধ যত,
পাবি তারে অবিরত ॥

(৪) শুন্দ ব্রহ্ম সন্মান—
সঁপ তারে তন, মন।
গাওনারে তাহারি গীতি,
তাহাতে যে আছে ওই
মহান् প্রীতি ॥

ক্লমাদেবীর কথা

[ক্লমাদেবী একজন অসাধারণ সাধিকা। ত্যাগ ও সেবায় পবিত্র তাহার জীবন। কৈলাসের কাছাকাছি দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহধর্মীণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হ'ন। মা আনন্দময়ীর মাহচর্য তাহার জীবনে কেমনতর হইয়াছিল তাহারই কাছ হইতে সংগৃহীত এই টুকরা প্রবন্ধ হইতে সে কথা কিছু বোঝা যাইবে।]

“আমি চৌদাস আশ্রমে আসিয়া শুনিয়াছিলাম, আনন্দময়ী
মা কৈলাস যাইবার মানসে যাত্রা করিয়া আসিতেছেন। মায়ের
সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমার মন তখন হইতেই খুব উত্তলা
হয়।

আশ্রমের কাজে আমায় সেই সময়ে আল্মোড়া যাইতে
হইতেছে। রওনা হইয়াছি। পথে ‘খেলা’ পড়ে। ‘খেলা’য়
পৌছিবার পূর্বে শুনিতে পাইলাম সেইদিনই মা ধারচোলা হইতে
খেলায় আসিবেন। খেলায় যে দোকানে মা’র থাকিবার কথা
ছিল আমিও ভাগ্যক্রমে সেই দোকানেই গিয়া উপস্থিত—মায়ের
পৌছিবার এক ঘণ্টা আগেই। মায়ের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য
পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে মা আসিতেছেন। ভোলানাথ (মায়ের পান্তি) সঙ্গে আছেন। ভাইজী আছেন। আরও অনেকে আছেন। মাকে দেখিয়া আমি প্রণাম করিলাম। মা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার পরিচয় জানিয়া খুবই পরিচিতের ক্ষায় ব্যবহার করিলেন।

প্রথম দর্শনেই মাকে আমার খুব ভাল লাগিল। অন্তরে আনন্দের ধারা বহিল। মাকে বলিলাম, আমার গুরু শ্রীমা'র নিকটে গেলে আমার ভিতরে যে প্রকার আনন্দ হইত মায়ের কাছে সেই প্রকার আনন্দ জাগিতেছে। মনে হইল, মায়ের সঙ্গ আমি আর ছাড়িব না। কিন্তু তাহারা তখন কৈলাস চলিয়াছেন। আমি আল্মোড়ার পথে।

মায়ের সঙ্গে কিছুদিন থাকিবার অনুমতি চাহিলাম। মা খুবই খুশি হইয়া অনুমতি দিলেন। কথায় কথায় মা আমায় বলিলেন, ‘দর্পণ পরিষ্কার করিলে যেমন তাহাতে নিজের প্রতিমূর্তি পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত হয় তেমন চিন্ত শুন্দি হইলে আত্মস্বরূপ তাহাতে পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া ওঠে। সেই ভাবে চিন্তশুন্দি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা কর। তাহাটি লাভ করা দরকার।’

পরদিন সকালে মাকে প্রণাম করিয়া আল্মোড়ার পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে আসিতে আসিতে আমার মনে হইতেছিল যেন আমার শরীর এবং মন অত্যন্ত শুন্দি এবং নির্মল হইয়া গিয়াছে। মনে প্রগাঢ় আনন্দের অনুভূতি।

আল্মোড়াতে পাঁচ দিন কাটাইয়া আমি চৌদাস আশ্রমে

চিঠি ও মায়ের উত্তর

নিউ দিল্লী

১১ই মাঘ, ১৩৫৪।

মা,

চলে আয় আমার কাছে। আয় আয়। কাছে আরও কাছে। এই এখানে। এই যে। কাছে, পাশে, সামনে, পিছনে আয়। আয় আমাকে ঘিরে। আয় আমাকে ঢেকে। আয় আমার মাথায়। আয় আমার সকল দিকে। আয় আমার বুকে, আয় আমার মাঝে। আমায় জুড়ে থাক। আমায় ডুবিয়ে দে—তোর মাঝে। ওরে! তুই! এই যে। আমায় তোতে দূরত্ব না র'ক। আমি তোতে, তুই মোতে। আমার সাধনা, আমার ভাবনা, আমার বৃক্ষ, আমার চেতনা তুই তুই তুই।

হে পরম সত্য! শোনাও শোনাও, জানাও জানাও যে আছ—এই এইখানেই আছ। দেরী নয়, সঙ্কোচ নয়, ভয় নয়—আমার সত্য, আমার মা এই যে!

অভয়।

মায়ের জবাব—

“তাঁর ডাকের সঙ্গে ডাক মিল্লেই সেই সেই সেই। আনন্দ।”

মা,

আজ খানকতক চিঠি পেলাম তোর ওখান থেকে। দিনি
যদি ওখানে না থাকে তা হ'লে অন্ত কারকে দিয়ে আমার চিঠি
পড়িয়ে জবাব দিবি তাড়াতাড়ি ক'রে। এখন তো বুনিদি'ও
ওখানে আছে বুঝি। আমার চিঠিগুলোর তোর ওখানে গিয়ে
পড়ে থাকটা আমার স্মৃতিধাজনক মনে হয় না।

আমার একটা আকঙ্ক্ষা জেগেছে। পূরণ করা না করা
তোর হাত। আকঙ্ক্ষাটি এই। ভগবান মানুষের দেহ নিয়ে
আবিভূত হবেন। তাঁর সঙ্গ আমি পাব একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের
বন্ধনে। আমি তাঁকে উচ্চ আসনে বসিয়ে ভোগরাগের বন্দে-
বন্ত কর্ব না, আসন নিয়ে চাম্পল নিয়ে পিছন পিছন দৌড়ব
না—আমি তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বেড়াব। এক আসনে বসে
রমচর্চা করতে আমার একটুও বাধ্ব না। একসঙ্গে খেতে
শুতে আমাদের আনন্দের আর ইতি থাকবে না। আমার দরদী
সখা আর আমার মাঝখানে কোনও রকমের সঙ্কেচই আসতে
সঙ্কেচ বোধ করবে।

আমি কিন্তু হাড়ে হাড়ে জান্ব যে, এ ভগবান স্বয়ম্। কিন্তু
তাতে আমার বন্ধুত্ব আটকাবে না। কারণ আমার নিজের
সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকবে যে আমি তাঁর বন্ধুই। অন্ত সব
অবস্থা, সব ঘটনাকে ছাপিয়ে এ বন্ধুত্বের সম্পর্কটি অতি গভীর

নিউ দিল্লী

১৫ই মাঘ, ১৩৫৪।

চিঠি ও মায়ের উত্তর

১৩

অথচ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ'বে। ভগবানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের
যোগ্যতাটি সেখানে স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বাভাবিক।

আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা এই। ইতি।

তোর অভয়।

মায়ের জবাব—

“তিনিই পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু, পরম পতি—
একাধারে যে সব।”

নিউ দিল্লী

১৫ই মাঘ, ১৩৫৪।

মা,

আমায় নিয়ে চল। কোথায় জানিস? ঘোর শুশানে।
যে শুশান লাখো লাখো নশ্বর দেহের পরিসমাপ্তির সাক্ষী,
যেখাকার আবহাওয়া অসংখ্য জননীর, স্ত্রীর, পুত্রের, পতির,
বন্ধুর বিচ্ছেদ ব্যাথার স্পর্শে পবিত্র-গন্তীর সেই শুশানে।

শুশানটি অবস্থিত নদীর তীরে, লোকালয়ের বাইরে।
দিনের বেলায় সেখানে গেলে সাধারণ লোকের গা ছম্ছম
করে। চারপাশেই ছড়ানো হাড়, মাথার খুলি। একদিকে
সমারোহ চলেছে শেয়ালে কুকুরে। আর একদিকে শকুনের
ভোজ। অর্ধদশ শরীর। এখানে পোড়াকাঠ, ওখানে ভাঙা
কলসী, ওদিকে একটা ছেঁড়া ময়লা ত্যানা। মাঝে মাঝে বোপ-
জঙ্গল। মড়া-পোড়ানোর দল যখন আসে—আসে। তা ছাড়া

জীবন্ত জন-মনিষি ধারে কাছে কোথাও নাই ।

মা, আমি রেতের বেলায় ঘাব। বিনা চাঁদের তিথি। অমাবস্যা। ঘোর অমাবস্যা। ভয়ানক অঙ্ককার বল্লে কিছু বলা হয় না। সে গাঢ় কালিমার ডান নেই বাঁ নেই, উপর নেই নৌচ নেই, পার নেই কুল নেই। কালো কালো কালো, কালোয় সব ঢাকা। জানোয়ারের চীৎকার আর পাখীর বাটপটানি ছাড়া এন্তার বিঁবির শব্দ খিম্ খিম্ খিম্ খিম্। চল্লতে গেলে কি সব পায়ে ঠেকে, নিশ্চয় মাথার খুলি কিংবা হাড়।

মা, আমাবস্যার আঁধারে, শুশানের সে বুকে আমি ভয় পাব না। ভয় পাব কি ক'রে? তুই যে সঙ্গে আছিস। তারপরে আমায় শেখা মা কি ক'রে মড়ার বুকের ওপর আসন ক'রে ব'সে তোর মরণ-হ্রণ স্মরণ করতে হয়, শেখা আমায় কি ক'রে সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশের মাঝামাঝে অভয়ার অভয় সন্তান হ'য়ে নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

মা, সেই পবিত্র শুশানে, সাধনার সেই মহাপীঠস্থানে তোর নগ্না, এলায়িতচিকুরা, নৃতনযৌবনা অপরূপ কালীমূর্তিতে আমার কাছে আয়। উলঙ্গ শিশু মায়ের স্তনপানে রত হোক। স্তনের মধ্য দিয়ে তোর সুধাশক্তি মুখে পড়া মাত্র আমার সকল বন্ধন খ'সে যাবে, যুগ্যুগান্তের গ্রানি মুছে যাবে, সেই ভয়ঙ্কর শুশানের পরিবেষ্টনী আমার কাছে এক অস্তুত রসের বস্তু হ'য়ে উঠতে দেরী হবে না। সেই আঁধার, সেই শুশান, সেই মা—তার আর তুলনা নেই।

মা, আমায় নিয়ে চল মা। এই দুনিয়ার এই সভ্যতা থেকে আমায় বাঁচিয়ে সেখানে নিয়ে চল।

আমার গ্রীতি নে মা। ইতি।

অভয়।

মায়ের জবাব—

“এই যে জালা এই কি এক রকমের শুশান নয়? মহাশুশান চাওয়াটা ত মঙ্গল।”

মা

যাহা বলিতে যাইতেছি সে বিষয়টি কি? ‘মা’। এ কোন মা? যাহা হইতে সকল পিতামাতা সেই মা। যাহা হইতে সব কিছুর প্রকাশ, যিনি সব কিছুই—আবার যিনি সব কিছুরই বাইরে সে সনাতনী মা।

তারই কথা। বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্রে যাহার মহিমা, যাহার অলঙ্গ্য বিধানে জীব স্থখের, দুঃখের স্বোত্তে ভাসিয়া চলে, শোকের, দুঃখের তাপে তাপিত হইয়া জীব যাহার মুখের পানে চায়, শরণাগত হইয়া যেখানে আঞ্চল্য মাগে এ তাঁহারই কথা। সেই তাঁহারই, জীবের দুঃখে করণাকাতর হইয়া যিনি আপনার পরমানন্দময় ক্রোড়ে তুলিয়া লন। তাঁহারই, যে বন্ধুকে যে প্রাণপ্রিয়কে প্রেমিকগণ ভালোবাসিবার জন্মই ভালোবাসিয়াছে, সর্বস্ব সঁপিয়াছে, যাহার জন্ম কত সাধক মাতোয়ারা হইয়া

আপনা খোওয়াইয়াছে।

তাহার কথা কি বলিব! কেমন করিয়া বলিব! বলা কি যায়! তবু বলিতে হইবে। মায়ের কথা যে। তাহার বিরাট, সম্পূর্ণতার বিধানে, আনন্দ্যের মাধুর্যে তিনি আমার অর্ধসৃষ্টি কথাকে একটি চরিতার্থতা দিবেন।

সত্যই তাহার অচিক্ষ্য লোলায় আজ একি হইয়াছে! তিনি আসিয়াছেন! যাহার যাওয়া আসা নাই তিনি আসিয়াছেন! যিনি চিরকাল ছিলেন, আছেন, থাকিবেন, যাহার সত্তায় সব সত্ত্বাবান—সেই তিনি আজ মা রূপে আমাদের মধ্যে! ব্যাপকতম হওয়াও আমাদের চোখে আজ আনন্দময়ী মা আমার সীমায় নিজেকে বাঁধিয়াছেন। ধরা দিয়াও ধরা দিতেছেন না বটে, কিন্তু ধরা না দিয়াও ধরা পড়িয়াছেন।

সবই মায়ের খেলা, মায়ের প্রকাশ। বিশ্বব্যাপী জীবভূলানো কারসাজি সেই মায়েরই। কিন্তু এমন খেলা তাঁর যে ভুলের পথেই ভুল ভাঙে। জীবহের নিগড় থাকে না যথন—শিবহের মুক্তিতে তাঁর আর এক প্রকাশ। কিন্তু আজ এ তাঁর কী কাণ্ড যে জীব এ জড়রাজ্যে তাঁহারই আঁচল ধরিয়া বেড়াইতেছে! আজ এ কী রহস্য, জীব সেই তাঁহারই সঙ্গ-বিচ্ছেদে স্মরণ করিয়া কাদিতেছে, আবার সঙ্গ পাইয়া আনন্দে মাতিতেছে—তাঁহারই সম্মুখে নাচিয়া গাহিয়া পাগল বনিতেছে।

জীব মোহাবৃত। সে চিরকাল আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যাহা যা নয় তাহাকে তাই বুঝিয়া বসিয়া আছে। স্তুলহের

ফিরিয়া গেলাম। আশ্রমে ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছিল। তুই মাইল দূরে গ্রামে এক মিত্রবাড়ীতে গিয়া মা'র আসিবার দিন গুণিতে লাগিলাম। অবশেষে মা ফিরিয়া আসিলেন। আমি ও মায়ের অনুমতি লইয়া মায়ের সঙ্গে চলিলাম।

পথে আসিতে আসিতে মা'র সম্বন্ধে আমার ধারণা হইল মা-ই সাক্ষাৎ ভগবতৌ। মা মানুষ-দেহ আশ্রয় করিয়া আসিলেও স্বরূপতঃ মানুষ নহেন। মা'র সঙ্গলাভ যতই হইতে লাগিল ততই আমার হৃদয়ে বিশ্বাস হইতে লাগিল যে মা'র সঙ্গে থাকিতে পারিলে আমার আরও আনন্দ লাভ হইবে।

আলমোড়ার দিকে আসিতেছি। পথে ধারচোলাতে ভাইজীর অসুস্থতার জন্য আমাদের চার পাঁচ দিন থাকিতে হইয়াছিল। তখন অন্তরে আমার খুব নাম চলিতেছিল এবং মায়ের স্বরূপ দর্শনের জন্য আমার বুকের ভিতর ধ্বনি ধ্বনি করিয়া একপ্রকার কম্পন অনবরত হইতেছিল।

আলমোড়ায় আসিলাম। ভাইজী অসুস্থ। সকলেই খুব ব্যস্ত। পরে তাঁর দেহত্যাগ হইল। আমরা আলমোড়া হইতে দেরাদুন আশ্রমে আসিয়া পৌছিলাম।

দেরাদুন আসিয়া আমার শরীরটা একটু খারাপ হইল। এখানে আমার সেই কম্পন অন্তর্ভব করিতে লাগিলাম। অসুস্থতার ভিতরেও আনন্দের নেশা অন্তর্ভব হইতে লাগিল। এক সপ্তাহ বিশ্রাম গ্রহণের পর আস্তে আস্তে শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল।

শরীর সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন ধ্যানের দিকে খুব

অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে মনে হইল যেন সব সময়েই মন আঙ্গদর্শনের জন্য ব্যাকুল। ধ্যানের ভাবে যখন মন ডুবিতে চাহিত তখনই ‘মা, মা’ করিতাম ও চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইত।

আনন্দময়ী মা’র রূপ ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিতাম যেন ঐ রূপ চলিয়া গেল, তাহার স্থানে কখনও রামচন্দ্রের, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের রূপ আমার হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছে। মন ভাব সমাধিতে ডুবিয়া যাইত কিন্তু তাহাতে আমার বাহিরের জ্ঞান লুপ্ত হইত না। অন্তরে কে যেন বলিত, “সব রূপ দেখিয়া লও।” আর চলচ্ছিত্রের ছায়ার ত্বায় একটার পর একটা রূপ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত।

কখনও বা মনে হইত আমার কুণ্ডলিনী যেন ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতেছে। ধ্যানে মনে হইত যেন একজন মেয়ে আসিয়া আমার মন্ত্রকে ফুল দিয়া আরতি করিতেছে। কখনও ধ্যান করিতে বসিয়া আমার শরীর দক্ষিণ এবং বাম দিকে কম্পিত হইতে লাগিল। অন্তরে মনে হইত কে যেন বলিতেছে, “সর্চিদানন্দের আনন্দ লুটিয়া লও।”

কখনও মনে হইত আমার মাথার উপর একটি ছায়া পড়িয়াছে এবং বোধ হইত আমার এই শরীরও নাই, মনও নাই, আমি আনন্দ-স্বরূপ। ধ্যান ছাড়িয়া গেলে আমি পাগলের মত মা’র কাছে ছুটিয়া যাইতাম। সেই অবস্থায় যখন মা’র চরণে প্রণাম করিতাম তখন মনে হইত কে যেন মা’র চরণে আমাকে চাপিয়া

ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি উঠিতে চাহিতাম না। স্বতঃই শৌন্ভাব আসিয়া পড়িত।

কখনও কখনও মনে হইত যেন আমার ও মায়ের শরীর অভেদ। শরীরে এক প্রকার মাদকতা অন্তর্ভব করিতাম। শরীর অবশ হইয়া যাইত, শারীরিক সর্বপ্রকার ক্রিয়া সাময়িকভাবে বঙ্গ হইয়া যাইত। কখনও দেখিতাম আমার অন্তরে মা, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্তি একটার পর আর একটা প্রকাশ পাইতেছে এবং কে যেন ভিতর হইতে বলিতেছে, “দেখ দেখ, দেখিয়া লও।” কে যেন আনন্দময়ী মাকে দেখাইয়া বলিতেছে, “ইনিই রাম, কৃষ্ণ, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। ইনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন।”

কখনও দেখিতেছি অন্তরে মা বসিয়া আছেন এবং উপরে লেখা রহিয়াছে—‘আঝা আঝা আঝা।’ কে যেন বলিতেছে, ইনিই আঝা।

আমি একদিন হলঘরে বসিয়াছিলাম ক্রমে ভগবানের কথা ভাবিতে ভাবিতে শরীর অবসন্ন হইল এবং আমি শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ দর্শন হইল। সমস্ত দিন আমার ঐরূপ নেশার ভাবে কাটিল। সন্ধ্যাবেলায় মনে হইল মা যেন আমার মাথায় হাত দিলেন। আমি ‘মা, মা’ বলিতে বলিতে মা’র হাত ধরিতে গেলাম। দেখিলাম কেহই নাই।

* * *

কিছুদিন পর মা’র সঙ্গে হরিদ্বার হইয়া নর্মদা আসার পথে

দিল্লীতে ট্রেইন হইতে যমুনা দেখিয়া কৃষ্ণের ভাবে আমার মন এমন ভাবে তন্ময় হইয়া গেল যে আমি বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিলাম মা যেন কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চোখ দেখিয়া চিনিলাম ‘ইনিই মা’। আমার শরীর অচল হইয়া গেল। আমি বহুক্ষণ চোখ বুঝিয়া পড়িয়াছিলাম।

* * *

বরোদাতে দিনের বেলায় শুইয়া ছিলাম। মনে হইল সকলে মাকে খুঁজিতেছে, মা কোথায়, মা কোথায়? মা তখন আসিয়া আমাকে যেন জড়াইয়া ধরিয়া আছেন। ইহা স্মপ্তের কথা নহে।

দেরাদুনে একদিন দেখি আমি মা'র ঘরে বসিয়া আছি, মা হাতছানি দিয়া আমায় ডাকিতেছেন। একদিন এমন হইল মা যেন আমার সঙ্গে শুইয়া জড়াইয়া ধরিয়া আছেন।

আমি যখন মা'র কাছে থাকি তখন কেবলই মনে হয় মা মন্ত্র নয়, মা'র মুখে কৃষ্ণমূর্তি আর শরীরে দেবীমূর্তি দেখি।”

এই আবরণ ভেদ করিবার মত চক্ষু তাহার নাই। আজ এ কৌ করণা যে এই অঙ্ক জীবের শক্তিহীন স্তুল বাহ্যপ্রসারে ধরা দিবার জন্ম তিনি প্রকট।

স্বয়ং তিনি আসিয়াছেন।

একটি কথা। প্রয়োজন অনুসারে অবতার ক্রপে যে ভগব-
চক্রি অবতরণ করিয়া আগ্নপ্রকাশ করে তাহা ভগবানের এক
ভাব বিশেষ। কিন্তু সেই পরম বস্তু যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা,
ভগবান এ তিনি নামে আখ্যাত হ'ন তাঁর আবির্ভাব সন্তুর কি?
কিন্তু দেখানে তাঁর শক্তিতে সৌমানেখা কোথায় টানিব? তাঁহার
অচিন্ত্য স্বতন্ত্রতা তাই স্তুলে তাঁহার এমন আবির্ভাব।

আমাদের চোখে তাঁহার এ অসুত আবির্ভাব কিন্তু তাঁহার
অনন্ত সম্পূর্ণতার মধ্যে তাঁহার রাজ্যে এ বিগ্রহ কি তাঁর নিজের
নিত্যকালের জিনিষ নয়?

রায়পুর আশ্রমের কথা। একদিন এক ভদ্রলোক মাকে
প্রশ্ন করিতেছিলেন, “মা আপনি পূর্বে কোথায় ছিলেন? “মা
বলিলেন, “এখন যেখানে সেখানে।” প্রশ্নকর্তা বলিতেছিলেন,
“আত্মার দিক দিয়া কথা নয়। এখন যেমন এখানে বসিয়া
আছেন তেমন পূর্বে কোথায় ছিলেন বলুন।” মায়ের কিন্তু
ঐ একই জবাব।

মায়ের এই দেহ তো কেনিও একটি সন্তাবিশেষকে অব-
লম্বন করিয়া নহে। অথচ একটি দেহ, একটি আকার,
আমাদের ধরিবার ছুঁইবার মত একটি মূর্তি।

আমাদের তথাদৃষ্টি স্থুল দেহটাই ত' সর্বস্ব নয়। আরও কত দেহ রহিয়াছে। মায়ের তা নাই। মায়ের ঐ একটি দেহ এবং ঐ দেহই স্মৃক্ষদেহ, কারণ দেহ—চিন্ময় দেহও বটে। অজ্ঞানের বা জড়ত্বার কোনও আবরণই এই দেহে বর্তমান নাই। কিন্তু একটি কথা। মায়ের বিচিত্র প্রকাশ। লীলা হইতে পারে অনন্ত রকমে। সকল সন্তানার হৃষার খোলা।

প্রশ্ন উঠিতে পারে অনেক। কিন্তু আমাদের এখানকার দৃষ্টিতে এসব প্রশ্নের ওঠা। হায়! এদেশের দৃষ্টি এমন যে সে দেখায় তস্মিন অতদ্বৃন্দি হওয়াটাই স্বত্বাব।

মা আমাদের মধ্যেই কেমন হাসিয়া খেলিয়া আছেন অথচ কী বস্তু! মা বলিয়াছেন, তিনি সমস্তই সবিশেষ জানেন। একবার আমি জিজ্ঞাসা করি “খেয়ালে আসছে না—একথা তবে বলেন কি করিয়া?” মা বলিলেন, “খেয়ালে আসছে না মানে বল্বার খেয়াল হচ্ছে না।” আবার কখনও মা বলিয়াছেন, “জানাজানি কি? যা’ তাই।”

ভুবনেশ্বরে একবার কথা উঠিয়াছিল। মাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, মা নিজের দেহে যে প্রকার আমি-বোধ করেন অন্ত দেহেও সেইরূপ আমি-বোধ করেন না পার্থক্য আছে। মা বলিয়াছেন, “পার্থক্য নাই।”

একবার পুরীতে একজন মাকে জিজ্ঞাসা করেন, “মা, আপনার মধ্যে কি কোনও সংশয় ওঠে না? নানা প্রকার চিন্তা কি আপনার

মধ্যে কোনও বিক্ষেপ জন্মায় না?” মা বলিলেন, “সংশয় কাকে বলে সে গোলমাল নেই, চিন্তা ভাবনা কিছু নেই।”

জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, “আপনার বিকল্প আছে?” মা বলিলেন, “সংকল্প থাক্কলে ত বিকল্প থাক্বে।”

বস্তুতঃ মা’র মন নাই। তবে মা কথাবার্তা কহেন কি করিয়া, ব্যবহার করেন কি করিয়া? সাধারণ দৃষ্টিতে এ কথাটি স্বাভাবিক কিন্তু ব্যাপারটি তলাইয়া চিন্তা করিতে হইবে। মায়ের এই যে প্রকাশ, এই যে আবিভূত সত্তা ইহা শুন্দি চৈতন্যের বিলাস মাত্র আর কিছুই নহে। আলাদা করিয়া মন বুদ্ধি ইত্যাদি খণ্ডতা সেখানে কোথায়? মায়ের ক্ষেত্ৰে দৃষ্টিটাই ভিন্ন। সেখানে আছে অনন্তের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মোজাস্তুজি একাত্মতা। মায়ের দেহে ব্যবহার অনুরূপ যখন যে ভাব প্রকাশ পায় তাহা সেই অনন্তের ভাণ্ডার হইতে তৎকালের জন্য ফুটিয়া ওঠে বা আমাদের চোখে প্রকাশ পায়।

এখানে ইচ্ছা অনিচ্ছার দম্পত্তি নাই, বুদ্ধি বিচারের প্রশ্ন নাই। যেখানে সব আছে, যেখানে সব দম্পত্তি সমাহিত সেই মহাসত্তা হইতে মহাইচ্ছায় এই ব্যবহারগুলির প্রকাশ। শুন্দি ‘চিৎ’ এর বিলাস।

একবার মা চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি ভাবছেন?” মা বলিলেন, “কিছু না,” বলিলাম, “একেবারে চিন্তা করছেন না?” মা বললেন “না, একেবারে ধোওয়া মোছা। কখনও কিছু এল গেল, না হ’লে ধোওয়া মোছা, কোনও রকম চিন্তা নাই।” অনন্ত মনের অনন্ত চিন্তা ধাহার নিজস্ব তাহার

ধারা কি এমন ধারাই হয় !

আমাদের যেমন জন্মগ্রহণের পর ধীরে ধীরে জ্ঞানের উন্মেষ হয় মায়ের তেমন নহে। মা যাহা পূর্বে ছিলেন জন্মকালেও তাই, পরেও তাই। ব্যবহারিকভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় জন্ম হইতেই মায়ের জ্ঞান অব্যাহত ভাবে আছে। পরে একদিন মা বলিলেন, “আমার জন্মের তের দিনের দিন জগদানন্দ কাকার বাবা আমায় দেখিতে আসিয়াছিল না ?” মায়ের জননীর মনে পড়িল, একদিন সে আসিয়াছিল বটে। আর এক কথা, মা জন্মের পর কাঁদেন নাই। পরে বলিয়াছিলেন, “আমি কাঁদিব কেন ? আমি বেড়ার ফাঁক দিয়া আম গাছ দেখিতেছিলাম।”

মা সাধক নয়, সিদ্ধ নয়, অবতার অথবা আধিকারিক নয়, নিতাসিদ্ধ নয়—মা এসব কিছুই নয়। আবার মা সব। একমাত্র পূর্ণ বস্তুতেই ইহা সম্ভব যে সর্বাতীত হইয়াও ইহা সর্বাত্মক। মাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মা তুমি কে ?” মা বলিয়া-ছিলেন, “তুমি যা বল আমি তাই।”

সে কী জিনিস—যা বল তাই ! মা দয়া করিয়া যাহাকে যতটুকু বুঝাইবেন সে ততটুকু বুঝিবে।

অনেক দিন আগের একটি ঘটনা বলিতেছি। মায়ের দেহকে অবলম্বন করিয়া তখন সাধনার ক্রিয়াগুলি ফুটিয়া উঠিতেছিল। মায়ের ক্রিয়া দেখিয়া একজন অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন। সহসা মায়ের অঙ্গুত তেজ পরিলক্ষিত হইল।

মায়ের স্বামী ভোলানাথও মেখানে ছিলেন। যিনি অত্যন্ত

পতিভক্তিসম্পন্ন ঘরের বধু, মৃহু স্বাভাবিটি—এখন স্বামীর সম্মুখেই তার আর এক বিচিত্র ধরণ দেখা দিল। মাকে সে সময়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, “আপনি কে ?”^১ মা বলিলেন, “আমি পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।” ভোলানাথ যখন ঐ প্রশ্ন করিলেন মা জবাব দিলেন, “আমি মহাদেব, আমি মহাদেবী।”

এই যে “পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ” কথাটা মায়ের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল ইহার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কেহ বলিতে পারে, আবেশ। কিন্তু মায়েরই মুখ হইতে শুনা গিয়াছে যে তাহা নয়। কেহ বলিতে পারে, পূর্ব কোনও সংস্কারের ফলে এরূপ বাহির হইয়াছে। মা বলিয়াছেন যে, সেটাও নয়।

মায়ের দীক্ষার ক্রিয়া যেদিন শুরিত হয় তাহার পরে কয়েক দিনের মধ্যেই এ ঘটনা হয়। তাই একথা হওয়া স্বাভাবিক যে, দীক্ষার মত ক্রিয়া হইয়াছে বলিয়া হয়ত ওই সময়েতে সাময়িক ৫ই প্রকাশ, তাই মায়ের মুখ দিয়া এমনতর বাহির হইল। মায়ের কাছ হইতে জানা গিয়াছে যে তাহা নয়।

জ্ঞানীর অভ্যন্তরগ্রাম্য, বেদান্ত-প্রতিপাদিত, ত্রিবিধ দেহের অতিরিক্ত নিষ্ঠুর আত্ম-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া একথা মা বলেন নাই তাহা ও মায়ের মুখ হইতেই শোনা গিয়াছে।

মায়ের এমন তো হয় নাই যে নিজে জানেন না, আপনা আপনি মুখ দিয়া বাহির হইল। মা বলিয়াছেন, “কোনও অবস্থার কথাটি নয়। যা—তা।”

^১ প্রশ্নকর্তা ভাবিয়াছিলেন, কোনও কিছুর আবেশ হইয়াছে।

মায়ের জন্মগ্রহণটাই খেলা তারপরেও সব খেলাই। খেলিয়াই যাইতেছেন। আর মায়ের এ খেলায় জীব ধন্ত হইতেছে। মায়ের দেহ অথঙ্গ-ভাব-ঘন দেহ। মায়ের আবির্ভাব জীবের উপর পরম অনুগ্রহ।

মায়ের এ এক অস্তুত ব্যাপার। ব্যবহারিক হিসাবে মাশিয়ু করেন না। আর, আধ্যাত্মিকতা প্রচার করিবার কোনও প্রচেষ্টা অথবা ধর্মের কোন সংবন্ধ গঠন কিংবা কোনও মত প্রবন্ধন করিবার প্রয়োগ মায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মায়ের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে ধর্মভাব লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। কত কী হইতেছে! কত ভাবে কত লোক মায়ের সঙ্গ ও বাণীর আলোকে পথ দেখিয়া দেখিয়া পরমানন্দের পথে যাত্রা করিয়াছে, কত লোকের সংসার-গ্রীতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কত লোকে আত্মারা হইয়াছে—মাকে পাইয়া। “নিবিড় ঘন আধারে জলিছে শ্রবতারা।”

মাতৃচরণে কত লোক কত ভাবে আকৃষ্ট, মা কত ভক্তের সাধনার ধন, নয়নের মণি। মায়ের সংস্পর্শে আবহাওয়া ভগবদ্ ভাবে ভাবার্থিত হয়। মায়ের বৈচিত্র্যময় জীবনে দেখিতে পাই জ্ঞান্যায় জ্ঞান্যায় মায়ের আগমন আনন্দের হাট বসাইয়াছে, অসংখ্য ভক্ত-হৃদয়কে মাতাইয়া তুলিয়াছে। মায়ের উপস্থিতির উদ্ঘাদনা, আনন্দোলনাস কত ভক্তের হৃদয়ে গাঁথা হইয়া গেছে। আরও কত কথা।

হাবভাবে, কথাবার্তায়, প্রেমে, আনন্দে মা ইহাই জীবের

চোখের সামনে ধরিয়া দেন, “ওরে আমি তোর পর নই, আমি তোর আপনার হইতেও আপনার।” মায়ের এ বাণী যাহার অন্তরে গিয়া স্পর্শ করে সে আপনার জনকে পাইয়া একটা নিশ্চিন্তা অনুভব করে। বস্তুতঃ মা সব চেয়ে কাছে আছেন, নিজের ভিতরে আছেন আর হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহাই মায়ের পরিচয়।

ব্যক্তিগত সাধনায় মা উপদেশ দেন কাহাকেও জ্ঞান বিষয়ে, কাহাকেও উপাসনা ও অরুণ্ঠান বিষয়ে, কাহাকেও ভক্তি বিষয়ে আবার কাহাকেও হয়ত রাজযোগ বিষয়ে। নামজপ করিতেও বলেন। আবার কাহাকেও কোন ক্রিয়া-বিশেষের উপদেশ দিলেন এমনও হইয়াছে। আবার কথনও উচ্চ অধিকারের ধ্যানের নির্দেশ দেন। কথনও দেখিয়াছি মৌনী হইতে বলেন। মায়ের সংযম-ব্রতের উপদেশ অতি চমৎকার।

সাধারণ ভাবে উপদেশ দেন আবার প্রার্থী হইলে, মায়ের খেয়াল হইলে একেবারে ব্যক্তিগত ভাবে উপদেশ দেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ পাইয়া থাকে।

মা নিজে অনন্ত ভাবের সমষ্টি বলিয়া মায়ের কাছে সকল ভাবের সাধক আসিয়া থাকে। যে রকম যে সংস্কার বিশিষ্ট সাধকই আসুক না কেন মায়ের কল্যাণদৃষ্টিতে, মায়ের আশ্রয়ে সে নিজের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। শুধু এ জগতের নহে অন্তর্ভুক্ত স্তরের মহাপুরুষেরাও মায়ের কাছে কল্যাণ কামনায় আগমন করেন।

অনেক সময়েই যাহারা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার জন্ম মায়ের সমীপে আগত হয় মা তাহাদের ভাবটি ভঙ্গ করেন না। যাহার ঘেটি স্বাভাবিক সেটি লইয়া কি ভাবে প্রবেশ করিতে হইবে সেই কৌশলই মা ধরাইয়া দেন। যে কোনও অবলম্বন লইয়া অস্তম্যুক্তি হইতে বলেন। তাহাতে ঘেটি দরকার, ঘেটি ফুটিবার তাহার কাছে আপনিই প্রকাশিত হইবে—মা এইপ্রকার বলিয়া থাকেন। একটি নির্দিষ্ট ভাবধারার ভিতর জীবের সাধনাকে সীমাবদ্ধ করা মায়ের দ্বারা কেমন করিয়া হইবে? মায়ের সার্বজনীনতার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবধারার তো কোনও গুণই আসে না।

তবে একটি কথা আছে। সাধকের কৃচি ও ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলে সর্বদাই কি সাধক তাহার পক্ষে গ্রহণীয়, যথার্থ পথে চলিতে পারে? তাহা তো পারে না। কিন্তু এ কথা সাধারণ ক্ষেত্রেই। মায়ের ক্ষেত্রে এ গুণ আসে না। মায়ের দৃষ্টি সাধকের পিছনে পিছনে কাজ করিতে থাকে এমন কি সাধককে আগলাইয়া থাকে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরমার্থের উদ্দেশ্যে যে যে ভাবেই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করুক না কেন অন্তর্যামী মা তাহাকে উপযুক্ত দিকেই চালিত করেন। মায়ের কৃপায় তাহার ভিতরে যাহা যাহা প্রয়োজন সকল ফুটিয়া উঠিবে।

ঐ যে মায়ের কথাটি পিছনে রহিয়াছে উহা কম কথা নয়, উহার মধ্যেই সব চেয়ে বড় শক্তি। সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, পূর্ণ-বস্তু ভগবান, তাঁহার কৃপা মায়ের বাণী রূপে সেখানে কাজ করিতে

থাকে। ভগবানেরই যে আজ মাত্রমুক্তি। তাঁর বাণী, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর কার্য সব তাঁর দয়ায় মাখা।

মায়ের কার্য বা ব্যবহার একধারায় চলে না। এক এক জন এক এক প্রকারে মাকে পায়, এক এক জন এক এক প্রকারে গড়িয়া ওঠে। প্রত্যেক ব্যক্তির একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। তাই প্রত্যেকের সাধনা আলাদা। মায়েরও সেই অভ্যন্তরে ব্যবস্থা। কখনও এমনও হয় যে, মোহমুক্ত জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তাহার সৌভাগ্যফলে মায়ের ব্যবহার হইয়া ওঠে কঠোর ক্ষারাত্তের মত।

মায়ের সংস্কর্ণে আসিয়া জীব আপন আপন সংস্কার অন্ত্যায়ী মায়ের কাছ হইতে ব্যবহার এবং উপদেশ পাইয়া থাকে। মা সংস্কার লক্ষ্য করিয়া কোন সংস্কারে কি প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন এমন নহে। সেখানে বোবাবুবি কি? সেখানে জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিকাশ। মায়ের কাছে যে আসে বুঝিতে হইবে সেই মহাশক্তির ইচ্ছাতেই আসিয়াছে এবং মায়ের কল্যাণময় বিগ্রহের ব্যবহার, উপদেশ ইত্যাদি যেখানে যেমনটি হইবার আপনা হইতেই হইতে থাকে। আর একটি কথা, এই যে কল্যাণকুপণী মায়ের সংস্কর্ণে লোকের কল্যাণ হইতে থাকে ইহা সাধারণ কোনও কল্যাণ নহে। যেমন ভাবেই লউন না কেন এ তাঁহার অংতর্ময় ক্রোড়ে লইবারই ব্যবস্থা, অন্ত কোথাও নহে।

সাধনায় মায়ের সাহায্য যে কত রকমে পাওয়া যায় তাহার পরিমাপ নাই। অনেককে স্বপ্নে কৃপা করিয়াছেন। কত লোককে

স্বপ্নে মন্ত্রদীক্ষাও দিয়াছেন, কাহাকেও বা স্বপ্নে বা অনুরূপে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাই সব কথা নহে। আরও আছে, অনুর্ধ্বামীরূপে সঙ্গে থাকিয়া পদে পদে সহায়তা দেওয়া, বোধের প্রকাশ করা। নিজের মধ্যে ঘটটা মাকে পাওয়া যায় তাহা যথার্থ সঙ্গ এবং সে সঙ্গেই এটা বোঝা যায় মা কত নিবিড় ভাবে আপনার।

সাধনার অতি উচ্চ অনুভূতিসম্পন্না কৃষ্ণ মা'র কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি। ঢাকায় অবস্থানকালে ইনি মায়ের কাছে আসিতেন। আরও অনেকের কাছে গিয়াছিলেন। শাস্তিলাভের জন্য সুতীর ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্য তাহাকে পাগল করিয়াছিল তাই কৃপালাভের জন্য অনেক স্থানে ছুটাছুটি করাইয়াছিল। মায়ের কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর ছিল, মায়ের উপর অনুত্ত প্রেমে ও অৰ্কণ্ডে তৎকালে তিনি আঘাতার। হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে এমন অবস্থা হইয়াছিল মায়ের কাছে থাকিতেও মন চাহিল না। তত্ত্ব লাভের জন্য পাগল। সে সময়ে কাশীতে গিয়া ভগবৎ প্রেরণায় পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপরে সাধনা করিতে করিতে ভিতরের অবস্থা বিশেষভাবে খুলিয়া যায় এবং ক্রমে উচ্চ উচ্চ অনুভূতির রাজ্য প্রবেশ করিতে থাকেন। এই সময়ে মায়ের দর্শন পাইতেন। মায়ের সঙ্গে তাহার যে যোগ তাহা ধরা পড়িতে আরস্ত করিল। প্রথম প্রথম মা স্বপ্নে তাহাকে উপদেশাদি দিতেন, তারপরে আর স্বপ্নে নহে, ধ্যানাবস্থায় তিনি মায়ের সাক্ষাৎ পাইতেন। তারপরে মায়ের কত লীলাই অনুর্জিতে তাহার

সহিত হইয়াছে, মা কতভাবে তাহাকে উধৈ' তুলিয়া লইয়াছেন— সে সব অনুত্ত ইতিহাস। মা'র কাছ হইতে দূরে অবস্থান কালে ইনি কখনও কখনও মাকে স্তুলকৃপেও দর্শন করিয়াছেন।

ইংরাজি ১৯৪০ সালের কথা বলিতেছি। মা পুরীতে কিছুদিন ছিলেন। পুরীতে কৃষ্ণ মাও ছিলেন—মায়ের কাছে আসিতেন। একদিন রাত্রে কৃষ্ণমা'র সহিত মায়ের এক অপূর্ব লীলা ঘটিল— আমাদের এ জগতে নহে, অনুর্জিতের কোনোখানে। পরের দিন সকালে কৃষ্ণ মা আসিয়াছিলেন। মা বলিলেন, “কাল সারাটি রাত্রি তুমি আমার কাছে ছিলে।” কৃষ্ণ মা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, “আমি তো চুপ করিয়া ছিলাম তা তুমিই আগে কহিয়া দিলে।”

কোন্ সে স্থান জানি না, মা তাহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। সে অনুত্ত কৃপা। সে রাত্রের কথা মায়ের মুখে শুনিয়াছি, “ওকে অনেক কিছু বুঝান হ'ল। সবটাই যে এক সন্তা এই তত্ত্ব। ওকে যা যা বলা হচ্ছে সেটাই ও অন্তরে উপলব্ধি ক'রে নিচ্ছে, আর ভাবটা কি রকম স্থির দেখা গেল।”

কৃষ্ণ মা আমাকে বলিয়াছেন, “পুরীতে আসার পরও প্রথম দিকে মায়ের উপর আমার একটা অন্য ধারণা ছিল। মাকে শুধু বড় বলিয়াই জানিতাম। সেদিন রাত্রে মা আমাকে যাহা বুঝাইলেন সে কথা আগে বহুবার পাইয়াছি। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে নাই। ঐ দিন রাত্রি হইতে অন্তরে বুঝিয়াছি। তবে ভাবটি এখনও পাকা হয় নাই।”

এ'রকম হইয়াছে মা হয়ত বসিয়া কাহারও সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছেন কৃষণ। মা মায়ের পিছনের দিকে বসিয়াও দেখিতে পান, মা ঠাঁর দিকেই সহাস্য বদনে কথা কহিতেছেন।

এবার দেখি মায়ের সংস্পর্শ কি? মায়ের বাহিরের সঙ্গ—কেবল তাহা নহে। যে কোনও প্রকারে—মানসিক আরণে হটক অথবা অন্ত ভাবে হটক মায়ের প্রতি অভিমুখতা আসিলে মায়ের ছোওয়া লাগে। উহাই মায়ের সংস্পর্শ। মায়ের সংস্পর্শ প্রধানতঃ ছই রকমে লোকের উপর ক্রিয়া করে। কেমনে বলিতেছি।

পূর্বে মায়ের দেহাবলম্বনে যখন সাধনার অবস্থাণ্ডলি প্রকাশিত হইতেছিল তখন বিভিন্ন প্রকারের স্থিতি সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিত। প্রতি অবস্থারই একটা বিশিষ্ট প্রভাব আছে। 'মায়ের যখন যে অবস্থাটি আসিত তাহার প্রভাব স্বভাবতঃই ক্রিয়া করিত। তাই তখন মায়ের সংস্পর্শে ঘাঁহারা আসিতেন তাঁহাদিগকে আধার অচূর্ণারে মায়ের শুক্র প্রভাবে প্রভাবাবিত হইতে হইত। একবার এরকম হইয়াছে একজন মাকে স্পর্শ করামাত্রে বাহাজ্ঞান ঢাঁরাইয়া কিছু সময়ের জন্য এক আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিল। আরও উদাহরণ আছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উর্ধ্বগতির ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব লোকের উপর পড়িত। মায়ের মে সাহচর্যে জড় আচ্ছন্ন জীবের অন্তরণাজ্ঞে কত সুন্দরভাব জাগরিত হইত।

কিন্তু পরে যখন সাধনাবস্থার প্রকাশণ্ডলি চলিয়া গেল মায়ের জীবন অন্য এক রূপ নিল। সাধনার নানা ধারায় যে সকল

বিভিন্ন অবস্থার প্রকাশ হইয়াছিল তাহা লুকাইয়া গেল, মা ক্রমে ব্যবহারে হইলেন অনেকটা যেন সাধারণ। মায়ের চরিত্রের আর একটা দিক্ ফুটিয়া উঠিল। অপূর্ব মহিমা লইয়াই, খেয়ালের বৈচিত্র্য লইয়াই মা ব্যবহারের খেলাধূলায় ধরা দিলেন।

কিন্তু মায়ের মধ্যে রহিয়াছে সকল ভাবই, সকল অবস্থাই—কিছুই তো হারাইয়া যায় নাই। যদি কখনও কোনও প্রকার ভাবের সংঘার হটক এ খেয়াল হয় তাহা স্ফুরিত হয় বা মা তাহার স্ফুরণ করিয়া লন। তবে অনেক সময়ে অনেকের পক্ষে মায়ের গুণাতীত সন্তার প্রভাবটিটি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তখন কি হয়? তখন যাহার ভিতরে যে সংস্কার কোনওটাই অভিভূত থাকে না বরং প্রকাশ পায়, কিন্তু ধীরে ধীরে নিরন্তর দিকে যায়। মায়ের অনুগ্রহের এ আর এক রকমে প্রকাশ।

মায়ের কৃপাকৈবল্যময়ী মূর্তির কথা ভাবিলে স্তন্ত্রিত হইয়া যাইতে হয়। কৃপা করিবার জন্মই তাঁহার দেহের প্রকাশ, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিতে, প্রতি বাক্যে, প্রতি কার্যে কল্যাণ বর্ষিত হয়। নানা লৌলায়, নানা খেলায় তিনি জীবকে ডাকিয়া নিতেছেন।

মা অফুরন্ত ধনের ভাণ্ডারী। যার যেৱুপ চাহিদা, গৃহণ করিবার যেৱুপ সামর্থ্য সে সেইৱুপ লাভ করিতেছে। দিবার জন্য মা উন্মুখ হইয়া আছেন। দেওয়ার বৈচিত্র্যাত্মের শ্রীমদ্বালানন্দজী একবার মাকে বলিয়াছিলেন, “মা তোমার গাঁঠরী খোল।” মা বলিলেন “গাঁঠরী তো খোলাই আছে।”

এ গেল এক দিকের কথা। কৃপা যে সর্বদা কেবল আধাৰ

অঙ্গসারে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা নহে। যেখান হইতে সর্ব দুন্দের প্রকাশ, যাহা মূল স্থান যদি সেই স্বভাব হইতে অন্তর্গত অবতরণ করে তাহা হইলে আধাৰের পুঁশ টিকে না। সে কৃপার স্পর্শে সব কিছু আপনা হইতে চলিতে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে কৃপা বা অন্তর্গত হইলেও উহা স্বভাবেরই এক ধরণের আত্মপ্রকাশ, হটক তাহা অহৈতুকী কৃপা তবু উহা মায়ের খেলা।

বৃন্দাবনে মা একদিন বলিয়াছিলেন, “ইচ্ছা করিয়া কিছু করিনা, কিন্তু দেখা যায় সম্পূর্ণ অহৈতুক ভাবেও কেহ কেহ এ শরীরের নিকট কৃপা পায়।.....সব রকমই হয়।”

জীব নানা ভাবে ধন্ত হয়। সুকৃতির ফলেই অগ্রসর হটক বা পতিত হইয়াই দয়া লাভ করক সবটাৰ মূলে সেই এক কৃপা বা এক খেলা।

মোটের উপর মায়ের আবির্ভাবের একটা মন্ত্র দিক্ আছে। সেটি মায়ের করণার কথা, মায়ের প্রেমের কথা।

লৌকিক দৌকা মা দেন না একথা সত্য, কিন্তু মায়ের এ বিগ্রহের সংস্পর্শে যে আসে তাহার অন্তর্মুলে একটা ব্যাপার হইয়া যায়। তাহার ভিতরে ভগবচ্ছিকিৰ সঙ্গে যোগ হইয়া যায়। এ যোগ অখণ্ড, অচ্ছেদ। মা তাহাকে ভগবন্মুখী করিয়া লন, মা তাহাকে নিজের বুকে টানিবার জন্য আয়োজন করিতে থাকেন। সে বুবিতে পারক আৱ না পারক মা তাহাকে ধরিয়াছেন।

যে ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়া আমরা মাকে পাইয়াছি সেটিৰ দিকে যদি দেখি, দেখি এক অন্তুত বিচিত্রতা। এ নিজের

খেলা, নিজেৰ লীলা মা নিজেই রচিয়াছেন।

ছোটকাল হইতেই নানা সদ্গুণের অলঙ্কার মায়ের চরিত্রকে আদর্শ করিয়াছে। পরে কর্মজীবনে মায়ের কর্মকুশলতা, পতি-পরায়ণতা, নিঃস্বার্থতা ইত্যাদি মায়ের চরিত্রকে কেমন সুন্দর কেমন নিখুঁত করিয়া তুলিয়াছে দেখা যায়।

মায়ের মধ্যে যে সাধনার প্রকাশ হইয়াছে সেও এক আশ্চর্য! সকল ধারার সকল অবস্থার প্রকাশ নহে পূর্ণভাবে প্রকাশ একজনের মধ্যে কেমনে হয়? একজনের একটা রকম প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক—প্রকৃতি ও ভাব অঙ্গসারে। তাহাতে বহু বৈচিত্র্য থাকিতে পারে কিন্তু একটি সন্তানিশেষের ভিতর দিয়া ফুরণ তো! তাই থাকিবে একটি বৈশিষ্ট্য, একটি রকম। প্রত্যোকেরই একটা নিজস্বতা আছে না কি? এখানে পাওয়াৰ কথা, গড়িয়া ওঠাৰ কথা বলিতেছি। যেখানে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ সেখানে সকলই আছে সেখানকার কথা আলাদা। “যে যথা মাং প্রপঞ্চস্তে,” যে যেমন ভাবে ভজনা করে তেমন ভাবে ভজনা, তেমন ভাবে তাঁৰ ধৰা দেওয়া যে।

তাই, মায়ের চরিত্রে সকল ধারার সাধনা, সকল অবস্থা যে প্রকাশিত ইহা কেমনে সন্তুত? সন্তুত। মা যে সকল সন্তান কেন্দ্ৰ, সকল সন্তায় সন্তাবান, মা যে একাই অজন্ম, অনন্ত। এ সাধনা তো নিজেৰ জন্য সাধনা তাহা নহে।

মায়ের ভাব কেহ বলিয়া শেষ করিতে পাৰিবে না। সাধারণ ভাবে দুনিয়াৰ বুদ্ধি দিয়া দেখিতে গেলে খেই হারাইতে হইবে।

এত রকমারি ! এ এমন একটা ব্যক্তিহ যেখানে সব রকম ভাব আসিয়া আশ্রয় পায়। অস্তুত এ খেলা ! এমন গভীরতা আবার এমন হালকা ভাব, তেমে যাওয়ার ভাব—এমন মাত্ত এমন শিশুত ; এমন গান্ধীর্থ, এমন উল্লাস আর কোথায় ? এমন জ্ঞানের প্রকাশ আবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ হ'তে সাধারণ ব্যবহার ; এমন তেজ এমন নিখিলতা আর কই ? এমন স্বতন্ত্রতা, এমন শিশুসুলভ অধীনতা ; এমন অবিচল উদাসীনতা, এমন করণা আর কোনখানে ? এমন সার্বজীনতা ! মা কী জিনিয যেখানে জ্ঞানী, ঘোগী, ভক্ত তো আনন্দ পায়ই, একজন সাধারণ বিষয়ী লোকও আকৃষ্ট হয়, মুঝ হয় !

মায়ের লীলার কথা একটু বলি। অনেক সময়ে ভক্তদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য মা নানা স্থানে প্রকট হইয়া থাকেন।^১ মায়ের মুখে শুনিয়াছি যে, দরকার মত সেই স্থানে মায়ের দেহের আবির্ভাব ঘটে। এইখানে মা আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন অথচ একই কালে অন্তর্ভুক্ত আবিভূতা হইয়াছেন এমনও হইয়াছে। আবার মায়ের লীলায় মায়ের যাওয়ারও বাধা নাই। মায়ের যাওয়া তো নাই। আবার আছেও।

মায়ের কার্যক্ষেত্র শুধু আমাদের এই জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে। অন্য কত জগতেও মায়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অনবরত একুপ ঘটিতেছে। অনন্ত প্রকারে আবিভূত হইয়া মা খেলিতেছেন। যখন খেয়াল হয় মা নিজমুখে কত ঘটনা বিবৃত করেন।

মায়ের মুখে শুনা একটি বিচিত্র কথা বলি। যখন ব্যাপারটি হয় মা তখন আমাদের এই স্থলে রোগশয়্যায় পড়িয়া আছেন। মা দেখিলেন, মা মাঝখানে একটা উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন পায়ের কিছু অংশ ঝুলাইয়া। আপনার ভাবে বসা। মা দেখিতেছেন, সামনে ঘতদূর দৃষ্টি যায় অসংখ্য সাধু দাঢ়াইয়া আছেন। সমুদ্রের মত। বাম দিকেও তাই, পিছনের দিকেও সাধুর শ্রেণী চলিয়া গেছে। সামনের দিকে অধিকাংশ উলঙ্গ বালেংটি মাত্র পরা। কত বছকালের বৃক্ষ সাধুও আছেন। এক এক জায়গায় এক এক রকমের সাধু, আবার কোনও জায়গায় সব রকমের সাধু আছেন। মায়ের দশগুণ দিকে একটি বন, নাম কল্যাণ বন। সেই বনে বৃক্ষতলে ঋষি মুনি সব রহিয়াছেন, একদিকে আবার স্ত্রীলোকও কয়েকটি আছেন।

মা দেখিলেন প্রত্যেকেরই সঙ্গে মায়ের অন্তরে বাহিরে একটি অখণ্ড যোগ রহিয়াছে। আর, মা প্রত্যেকের মধ্যেই নিজ শরীরকে দেখিতে পাইতেছিলেন।

সকলে জোড় হস্তে মায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিজের নিজের ভাবে বিভোর হইয়া দাঢ়াইয়া আছেন। মায়ের মুখ দিয়া সে সময়ে বাহির হইল, ‘অখণ্ড-ভাব-ঘন’।^২

মায়ের অনন্ত মৃতি। শিবরূপে, কৃষ্ণরূপে, দশমহাবিদ্যা

^১ আমি যখন এ ঘটনাটি মায়ের কাছে শুনি মা একবারে বলেন নাই। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়া কথাগুলি মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। মায়ের কাছ হইতে জানিয়াছি যে ‘অখণ্ড-ভাব-ঘন’ কথাটা মায়ের এই বিগ্রহ
—৩

এত রকমারি ! এ এমন একটা ব্যক্তিত্ব যেখানে সব রকম ভাব আসিয়া আশ্রয় পায়। অন্তুত এ খেলা ! এমন গভীরতা আবার এমন হালকা ভাব, ভেসে যাওয়ার ভাব—এমন মাত্রত এমন শিশুত ; এমন গান্ধীর্থ, এমন উল্লাস আর কোথায় ? এমন জ্ঞানের প্রকাশ আবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ হ'তে সাধারণ ব্যবহার ; এমন তেজ এমন স্নিগ্ধতা আর কই ? এমন স্বতন্ত্রতা, এমন শিশুশূলভ অধীনতা ; এমন অবিচল উদাসীনতা, এমন করুণা আর কোনখানে ? এমন সার্বজনীনতা ! মা কী জিনিষ যেখানে জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত তো আনন্দ পায়ই, একজন সাধারণ বিষয়ী লোকও আকৃষ্ট হয়, মুঝ হয় !

মায়ের লৌলার কথা একটু বলি। অনেক সময়ে ভক্তদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য মা নানা স্থানে প্রাকট হইয়া থাকেন।^১ মায়ের মুখে শুনিয়াছি যে, দরকার মত সেই স্থানে মায়ের দেহের আবির্ভাব ঘটে। এইখানে মা আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন অথচ একই কালে অচল আবিভূতা হইয়াছেন এমনও হইয়াছে। আবার মায়ের লৌলায় মায়ের যাওয়ারও বাধা নাই। মায়ের যাওয়া তো নাই। আবার আছেও।

মায়ের কার্যক্ষেত্র শুধু আমাদের এই জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে। অন্য কত জগতেও মায়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অনবরত একুপ ঘটিতেছে। অনন্ত প্রকারে আবিভূত হইয়া মা খেলিতেছেন। যখন খেয়াল হয় মা নিজমুখে কত ঘটনা বিবৃত করেন।

মায়ের মুখে শুনা একটি বিচ্ছিন্ন কথা বলি। যখন ব্যাপারটি হয় মা তখন আমাদের এই স্থলে রোগশয়্যায় পড়িয়া আছেন। মা দেখিলেন, মা মাঝখানে একটা উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন পায়ের কিছু অংশ বুলাইয়া। আপনার ভাবে বসা। মা দেখিতেছেন, সামনে যতদ্র দৃষ্টি যায় অসংখ্য সাধু দাঢ়াইয়া আছেন। সম্মুদ্রের মত। বাম দিকেও তাটি, পিছনের দিকেও সাধুর শ্রেণী চলিয়া গেছে। সামনের দিকে অধিকাংশ উলঙ্গ বা লেংটি মাত্র পরা। কত বহুকালের বৃক্ষ সাধুও আছেন। এক এক জায়গায় এক এক রকমের সাধু, আবার কোনও জায়গায় সব রকমের সাধু আছেন। মায়ের দক্ষিণ দিকে একটি বন, নাম কল্যাণ বন। সেই বনে বৃক্ষতলে ঋষি মুনি সব রহিয়াছেন, একদিকে আবার স্ত্রীলোকও কয়েকটি আছেন।

মা দেখিলেন প্রত্যেকেরই সঙ্গে মায়ের অন্তরে বাহিরে একটি অখণ্ড যোগ রহিয়াছে। আর, মা প্রত্যেকের মধ্যেই নিজ শরীরকে দেখিতে পাইতেছিলেন।

সকলে জোড় হস্তে মায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিজের নিজের ভাবে বিভোর হইয়া দাঢ়াইয়া আছেন। মায়ের মুখ দিয়া সে সময়ে বাহির হইল, ‘অখণ্ড-ভাব-ঘন’।^২

মায়ের অনন্ত মৃত্তি। শিবরূপে, কৃষ্ণরূপে, দশমহাবিদ্যা।

^১আমি যখন এ ঘটনাটি মায়ের কাছে শুনি মা একবাবে বলেন নাই। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়া কথাগুলি মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। মায়ের কাছ হইতে জানিয়াছি যে ‘অখণ্ড-ভাব-ঘন’ কথটা মায়ের এই বিগ্রহ

ମୂର୍ତ୍ତିତେ ବା ଅନ୍ତରେ ମୂର୍ତ୍ତିତେ ମା ଭକ୍ତକେ ଦର୍ଶନ ଦିଯାଛେନ ।

ମାକେ ଆମରା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କୀ ବୁଝିବ ? ମା ଦେଶ ଓ କାଳେର ଉପରେ ରହିଯାଛେନ ଆବାର ସଙ୍ଗେ ସଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଚିତ୍ରେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତା । ମା ଏମନ ଏକଟି ଜିନିସ ଯେଥାନେ ଖଣ୍ଡ ଓ ଅଖଣ୍ଡ, ଏକଥିଲେ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମିଲିଯାଛେ । ବ୍ରନ୍ଦେର ଗତ୍ୟାଞ୍ଚିକ ଭାବ ଏବଂ ଅଚଳ ନିବିକାର ଭାବେର ମା ସମସ୍ୟା ।

ଦେଖିତେ ପାଇ ମାଯେର କାହେ କୋନ୍ତା ମତ ଛୋଟ କୋନ୍ତା ମତ ବଡ଼ ତାହା ନହେ । ଏମନ କି ମା ବଲେନ, “ଅମୁକ ମତଟା ବୈଶି ସତ୍ୟ, ଅମୁକଟା କମ ସତ୍ୟ ତାହା ନହେ । ସେ ଯା ବଲେ ତାହା ଠିକ ।”

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଗିଯାଛେ ସେ, ମାଯେର ଦେହକେ ଆଶ୍ରଯ କରିଯା ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାରେର ଭାବ-ଲହରୀ ଖେଳା କରିଯା ଆସିପାଇଛେ, ମେ ସକଳେର ଇଯତ୍ତା ହୟ ନା । ପାରିପାଞ୍ଚିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଭାବେର ସଙ୍ଗେ ମା ତଦମୁକ୍ତ ହିତିତେଛେନ । ସେମନ ଦରକାର ତେମନ ହଇଯା ଯାଯ । କଥନ୍ତା ମାଯେର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗମ୍ୟ ହୟ । କଥନ୍ତା ଅବାକୁ ହଇଯା ଚିନ୍ତା କରିତେ ହୟ । କଥନ୍ତା ମା କୌତୁକ କରେନ, କତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ହାତ୍ସରମେର ଅବତାରଗୀ କରେନ । ଏହିଟିର ମଧ୍ୟେ ମାଯେର କମ ମହିମା ? ତାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଶ୍ୱବିଲାସ-ବୈଭବେର କଥା ଭାବିଲେ କୃତ ହଇଯା ଯାଇତେ ହୟ କିନ୍ତୁ ତିନି ଏତ ବଡ଼ ହଇଯା ଏହି ଭାବେ ଖେଳା କରେନ ଇହା ମସକ୍କେଇ ଆସିଯାଇଲ । କିନ୍ତୁ ଇହାର ପୂର୍ବେ ଲୌକିକ ହିସାବେ ମା ଏକଥାଟା କଥନ୍ତା ଶୋନେନ ନାହିଁ ।

ଅଧିକତର ଆଶ୍ରଯଜନକ ଠେକେ ।

ସ୍ଵାମୀ ଭୋଲାନାଥେର ଜୀବନେ ମାଯେର ଖେଳା କମ ଦେଖା ଯାଇ ନାହିଁ । କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାସ୍ତ୍ର ଭୋଲାନାଥକେ ଖୁବହି ଭୁଗିତେ ହଇଯାଇଲ । ଶେଷେର ଦିକେ ଭୋଲାନାଥ କ୍ରମେ ଶାସ୍ତ୍ର ହଇଯା ଆସିଯାଇଲେନ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଯେର ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମମର୍ଗଭାବ ଆସିଯାଇଲ । ଦେହାନ୍ତକାଳେ ମା ତାହାର ସକଳ ଗ୍ରହି ଖୁଲିଯା ଦିଯାଇଲେନ । ଅଗ୍ର ଆସେ, ମାଯେର ସାଧନାର ଅବସ୍ଥାଗୁଣି ସଥିନ ଚଲିଯାଇଲ ଭୋଲାନାଥ ମାଯେର ପ୍ରଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦିଲିଯା ଯାନ ନାହିଁ । ତାହାର ଉତ୍ତର, ମାଯେର ଖେଳାଲେଇ ଏମନ ହଇଯାଇଲ ।

ମାଯେର ପ୍ରଭାବ ମାବେ ମାବେ ଭୋଲାନାଥକେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ତାହା ନହେ । ଭୋଲାନାଥେର ଭାବେର ନିଯମଗୁଡ଼ିକରେ ମା ତାହାକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯା ଗତି ଉତ୍ସର୍ଦ୍ଦିକେ ଚାଲିତ କରିଯା ଦିଯାଇଛେ ଏବଂ ତାହାକେ ଏକ ଜାତୀୟ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାଯା ସାମ୍ରାଜ୍ୟିକ ଉପମୀତ କରିଯାଇନ ଏକଥାରେ ସ୍ଟଟନାଓ ହଇଯାଇଛେ । କିନ୍ତୁ ଭୋଲାନାଥ ଅନୁମୂଳିକ ହଇଯା ଯାଉନ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦେର ପ୍ରକାଶ ହଟୁକ ଦେ ଖେଳାଲ ମାଯେର ତଥନ ହୟ ନାହିଁ । ଏମନ କି ଏକବାର ମା ଭୋଲାନାଥେର ଅନୁମୂଳିକ ଗତି ସ୍ଥଗିତ କରିଯା ବ୍ୟବହାରିକ ବହିମୂଳିକ କରିଯା ଦିଯାଇଲେନ । ତବେ ଇହାର ଭୋଲାନାଥେର ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ମିତି କରିଯାଇଲେନ ବଳା ବାହଳ୍ୟ ।

ମାଯେର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରେ ଅନେକ କିଛୁ ଆହେ ଯାହା ଦ୍ୱର୍ବୋଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମା ଯାହା କିଛୁ କରିଯା ଥାକେନ ତାହା ଦ୍ୱାରା

কেবলমাত্র কল্যাণই সাধিত হইতেছে, অকল্যাণ হয় না। ইহা
মায়ের মুখ হইতে শোনা কথা।

মায়ের জীবনের মধ্যে শুধু খেলা, খেলা আর খেলা।
আজ নয়, মা তো অনাদি অনন্তকাল অনন্তভাবে স্বভাবের
খেলা খেলিতেছেন। কত ভাঙাগড়ার খেলা, কত পাওয়া
না পাওয়ার খেলা, কত গতি-স্থিতির খেলা—কত রকম! নিজকে
লইয়া নিজেই লীলাবিলাসময়। আজ তাহার এ আবিভূতি-
তেও আন্তুত বৈচিত্র্য। স্বভাবেরই বৈচিত্র্য তাঁর এ।

মায়ের সংস্পর্শে আসায় অসংখ্য লোকের কল্যাণ হইয়াছে
ও হইতেছে। মা যখন ধরা দিয়াছেন তখন এ স্মরণ
আমাদের জীবনে সফল হউক। লীলাময়ের প্রেমলীলার রস
আৰ্ষাদন যে করিতে চায়, মায়ের ভিতরে আপনার অভিষ্ঠ
বিগ্রহকে লইয়া সে ধন্ত হউক। পরমাত্মাকে নিজমধ্যে
উপলক্ষ্মি করিয়া যে স্বষ্ট হইতে চায়, সে মাকে ওই ভাবেই
পাইয়া যোগযুক্ত হউক। যে জ্ঞান চায় মায়ের সংস্পর্শে
আসিয়া সে জ্ঞানস্বরূপে মাকে সাক্ষাত্কার করক। যে যে
ভাবে চায় মা আপনাকে তাহার ভিতরে সে ভাবেই প্রকাশিত
করুন। মা যে সত্য বস্ত। যে সত্য বস্তকে চায় সে যে
কোনও সম্পদায়ের হউক না কেন, যে কোনও ভাবের হউক
না কেন মা তাহার পরম বস্তু।

অভয়

তত্ত্বিতি।